International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
ISJN: A4372-3142 (Online) ISJN: A4372-3143 (Print)
Volume-XI, Issue-I, January 2025, Page No.31-38
Published by Scholar Publications, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: http://www.ijhsss.com
DOI: 10.29032/ijhsss.v11.i1.004

পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীতে ইৎসংজ্ঞাকরণ তথা অনুবন্ধলোপের যৌক্তিকতা

বিশ্বজিৎ পাত্র
সহকারী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ, বিবেকান্দ মহাবিদ্যালয়, হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 18.01.2025; Accepted: 30.01.2025; Available online: 31.01.2025
©2024 The Author(s). Published by Scholar Publication. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

India has a glorious history of grammatical study. The practice of grammar began in the Vedic period with the Sanskrit language in India. There is clear evidence of the practice of grammar in ancient India in the Mundakopanishad, the Gopathabrahmana, the Pratishakhyas, and the Shikshagranthas. In the history of Sanskrit grammar, the names of many Vaiyakaranas, such as Mahadeva, Brahma, Brihaspati, Indra, Bharadwaja, Shakalya, Shaktayana, Vyari, Apishali, Kasyapa, Gargya, Galava, and many other communities such as Oindra, Chandra, Jainendra, Shaktayaniya, Kashyapi, Paniniya, etc. are found. However, it is the Pāṇini and Pāṇiniya communities that have been awarded the title of excellence in terms of their scientific interpretation of Sanskrit grammar, brevity of texts, availability of original texts, explanation, annotations, and adoption of various basic techniques. Therefore, today we understand Panini and his community primarily as Sanskrit grammar. To make his Ashtadhyayi concise, substantial, and scientific, Mahamuni Panini has used special terminology words like Mahasangna, Laghusangna, Anubritti, Biparinama, Adesha, Agama, Itsangna and Anubandhalopa etc. and adopted various techniques. Generally, the main task of grammar is to analyze the meaning of the words used in the language by classifying their 'Prakriti-Pratyaya'. In Ashtadhyayi, the prakṛtis and pratyās that are used by Mahamuni Pāṇini, during the analysis of the Sanskrit language 'Itsangakbarnas' are used. These 'Itsangavarnas' disappear naturally. And that brings us to the question, is it necessary to use things that disappear? Is it not better to remain unmentioned for unnecessary letters where the grammarians are as happy to have children as they are able to reduce 'the Matras' by half? But such questions arise because of our lack of knowledge. Basically, in the Ashtadhyayi of Panini, the importance of these 'Itsangakvarnas' is immense. In this article, we will discuss with the help of some examples why Panini kept the 'Itsangakvarnas' with pratyas, though he knew that they would vanish.

Keyword: Samaskritabhasha, Vyakarana, Panini, Ashtadhyayi, Itsanga, Anubandhalopa, pratyaya, Pratyahara.

ভূমিকা: ছাত্রাবস্থায় ব্যাকরণের প্রথম ক্লাসগুলিতে শিক্ষক মহাশয়েরা প্রায় সকলেই একটি কথা দিয়ে শুরু করতেন- আচ্ছা বলত ভাষা কাকে বলে? আমরা অনেকে একটু ইতস্তত করতে করতে নীচু স্বরে বলতাম যার মাধ্যমে আমরা মনের ভাব প্রকাশ করি তাই হল ভাষা। মাষ্টারমশাই একটু হেসে বলতেন আমরা তো অনেক ভাবেই মনের ভাব প্রকাশ করি যেমন ১। বিভিন্ন যন্ত্র বা বিভিন্ন পদার্থের ঘর্ষণজনিত আওয়াজের মাধ্যমে ২। বিভিন্ন আকার ইঙ্গিত বা নৃত্যের মাধ্যমে ৩। বিভিন্ন চিত্রাঙ্কনের মাধ্যমে ৪। আমাদের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সুনির্দিষ্ট অর্থযুক্ত ধ্বনিসমষ্টির মাধ্যমে। কিন্তু এর মধ্যে অন্তিম মাধ্যমটিকেই অর্থাৎ মানুষের বাক্‌যন্ত্রের সাহায্যে উচ্চারিত সুনির্দিষ্ট সার্থক ধ্বনি সমষ্টির মাধ্যমে যখন আমরা মনের ভাব প্রকাশ করে একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করি তাকেই শুধুমাত্র ভাষাবিজ্ঞানীরা ভাষা সংজ্ঞায় আখ্যায়িত করেন। তারপরেই বলতেন বলত ব্যাকরণ কাকে বলে? আমরা পূর্বের মতই নীচু স্বরে বলে উঠতাম ভাষার শুদ্ধতা রক্ষার জন্য বৈয়াকরণরা যে কতকগুলি নিয়ম করে দিয়েছেন সেই নিয়মগুলিকেই আমরা সাধারণভাবে ব্যাকরণ বলি। তারপরের প্রশ্ন হত ভাষা আগে; না ব্যাকরণ আগে? আমরা উত্তর দিতাম ভাষাই তো আগে কারণ ভাষাকে রক্ষা করার জন্যই তো ব্যাকরণ। আর আমাদের গ্রামে যারা পড়াশোনা করেনি, যারা ব্যাকরণ জানে না তারাও তো ভাষা বলতে পারে। তাহলে ভাষা বলার জন্য ব্যাকরণ প্রাথমিক শর্ত নয়। ভাষার সৃষ্টি হয়েছে অনেক আগে, তারপর ব্যাকরণ। মূলত প্রাথমিক অবস্থায় মানুষ তার জৈবিক প্রয়োজনে অস্ফুট আওয়াজ করে বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের মাধ্যমে একে অপরের সঙ্গে ভাব বিনিময় করত। তারপর ক্রমে ধীরে ধীরে সুস্পষ্ট ধ্বনি সহযোগে সুনির্দিষ্ট বিষয়কে বুঝিয়ে মনের ভাব বিনিময় করতে শিখেছে, সৃষ্টি হয়েছে এক মাধ্যমের; সৃষ্টি হয়েছে ভাষার। কিন্তু এই ভাষা নিয়ত পরিবর্তনশীল। মানুষের উচ্চারণের তারতম্যের কারণে, ভৌগলিক পার্থক্যের কারণে ভাষা তার পূর্ববর্তী রূপ থেকে সরে গিয়ে নতুন রূপ পরিগ্রহণ করে। এটাই ভাষার স্বাভাবিক ধর্ম। যেমন বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেই ধরুণ, মূল কথ্য বাংলা ভাষা থেকে রাঢী, বঙ্গালী, কামরূপী, ঝাড়খণ্ডী, বরেন্দ্রী প্রভৃতি উপভাষার সৃষ্টি হয়ে গেছে। এই পরিবর্তনে আমাদের কিছু লাভও হয়, আবার কিছু লোকসানও হয়। এর ফলে আমরা যেমন নতুন কিছু ভাষা পাই ঠিক তেমনি মূল ভাষা থেকে ক্রমে ক্রমে দূরে সরে যাই এবং একসময় মূলভাষায় রচিত সাহিত্যকৃতি, ইতিহাস প্রভৃতি অমূল্য তথ্যকে হারিয়ে ফেলি। সেই সঙ্গে হারিয়ে যায় আমাদের অতীত। এইরকম পরিবর্তন ও পরিস্থিতিকে আটকানোর জন্যই ব্যাকরণশাস্ত্র চর্চার সূচনা হয়। গর্বের বিষয় এই ব্যাকরণশাস্ত্র চর্চা ভারতবর্ষের মাটিতেই প্রথম শুরু হয় এবং তা জননীস্বরূপা সংস্কৃত ভাষার হাত ধরেই। মূলত বৈদিক সময় থেকেই এই ব্যাকরণ চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। অথর্ববেদীয় 'মুণ্ডকোপনিষদ্' ও 'গোপথব্রাহ্মণ' গ্রন্থ দুটি প্রাচীন ভারতে ব্যাকরণ চর্চার সুস্পষ্ট প্রমাণ দেয়। গোপথ ব্রাহ্মণের একস্থানে বলা হয়েছে- 'কিং বৈ ব্যাকরণম্' (১/২৪)। এছাড়াও উল্লেখিত হয়েছে- ওকারং পৃচ্ছাম:। কো ধাতু:? ক: প্রত্যয়:? ক: স্বর:? কিং প্রাতিপাদিকম্? কিং নাম? কিমাখ্যাতম্? কিং লিঙ্গম্? কিং বচনম্.... ইত্যাদি। এমনকি অব্যয়ের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে যে বহুপ্রচলিত কারিকাটি আমরা প্রায়শই উল্লেখ করে থাকি-

'সদৃশং ত্রিষু লিঙ্গেষু সর্বাসু চ বিভক্তিষু।
বচনেষু চ সর্বেষু যন্ন ব্যেতি তদব্যয়ম্।।' (১/১৬)।

এটিও গোপথব্রাহ্মণেই উল্লেখিত। মুণ্ডকোপনিষদে অপরা বিদ্যার আলোচনা প্রসঙ্গে স্পষ্টই ব্যাকরণের উল্লেখ করা হয়েছে- 'দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে ইতি হ স্ম যদব্রহ্মবিদো বদন্তি পরা চৈবাপরা চ। তত্রপরা ঋগ্বেদো যর্জুবেদ: সামবেদোথর্ববেদ: শিক্ষা কল্পো ব্যাকরণং নিরুক্তং ছন্দো জ্যোতিষমিতি।' মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি ঋকসংহিতায় ব্যাকরণের অস্তিত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে ঋকগ্বেদের একটি মন্ত্রের উল্লেখ করেছেন-

'চত্বারি শৃঙ্গা ত্রয়ো অস্য পাদা দ্বে শীর্ষে সপ্ত হস্তাসো অস্য।
ত্রিধা বদ্ধো বৃষভো রোরবীতি মহাদেবো মর্ত্ত্যা আবিবেশ।।' (৪/৫৮/৩)

এই ঋকটির অর্থ- এর চারটি শৃঙ্গ, তিনটি পাদ, দুটি মস্তক, সাতটি হস্ত। ইনি (যজ্ঞীয় অগ্নি) অভিষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হয়ে অত্যন্ত শব্দ করছেন। মহতী দেবতা মর্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করছেন। পতঞ্জলি এটির ব্যাকরণপক্ষে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেছেন- 'চত্বারি শৃঙ্গানি চত্বারি পদজাতানি নামাখ্যাতোপসর্গনিপাতাশ্চ। ত্রয়ো অস্য পাদা: ত্রয়: কালা: ভূতভবিষদবর্ত্তমানা:। দ্বে শীর্ষে শব্দাত্মানৌ নিত্য: কার্যশ্চ। সপ্ত হস্তাসো অস্য সপ্ত বিভক্তয়:। ত্রিধা বদ্ধ: ত্রিষু স্থানেষু বদ্ধ উরসি কণ্ঠে শিরসীতি। বৃষভো বর্ষণাৎ। রোরবীতি পুন: পুন: শব্দং করোতি।' এছাড়াও 'চত্বারি বাক্ পরিমিতা.....(১/১৬৪/৪৫), 'উত ত্ব: পশ্যন্ন দদর্শ..... (১০/৭১/৪), 'সক্তুমিব তিতউনা পুনন্তো যত্র..... (১০/৭১/২), 'সুবেদো অসি বরুণ যস্য..... (৮/৬৯/১২) প্রভৃতি ঋকমন্ত্রগুলিতে ব্যাকরণের গূঢ়তত্ত্ব চর্চিত হয়েছে। যাই হোক পূর্বোক্ত তথ্যের ভিত্তিতে ব্যাকরণ চর্চার গোড়াপত্তন যে বৈদিক সময়েই হয়েছিল সে বিষয়ে কারোরই সংশয় থাকার কথা নয়।

পাণিনি ও অষ্টাধ্যায়ী: পূর্ববর্তী আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যায় যে মোটামুটি বৈদিক সময় থেকেই সংস্কৃত ভাষার হাত ধরে ভারতবর্ষে ব্যাকরণশাস্ত্র চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছিল। হয়তো তা বিস্তৃতাকারে না হয়ে ক্ষুদ্র পরিসরে হত। কিন্তু তা ধীরে ধীরে খ্রিষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে পঞ্চম শতাব্দীতে পাণিনির সময়ে এসে এক বটবৃক্ষে পরিণত হয়েছিল। পাণিনির পূর্বে বহু বৈয়াকরণ ছিলেন যারা সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্র নিয়ে চর্চা করেছেন। কিন্তু তাদের গ্রন্থগুলি আমাদের কাছে উপলব্ধ না হওয়ার জন্য সেগুলির ভালো মন্দের বিচার করা আমাদের পক্ষে কখনই সম্ভব নয়। কিন্তু অষ্টাধ্যায়ীতে পাণিনির বিজ্ঞানভিত্তিক ব্যাখ্যা, এবং ব্যবহৃত বিভিন্ন মৌলিক কৌশল সত্যই সকলকে বিস্মিত করে। এছাড়াও মূলগ্রন্থ, বিভিন্ন বৃত্তিগ্রন্থ, টীকাগ্রন্থের সহজলভ্যতা, গ্রন্থের সংক্ষিপ্ততা প্রভৃতি পাণিনিকে সংস্কৃত ব্যাকরণজগতে শ্রেষ্ঠ বৈয়াকরণের শিরোপা এনে দিয়েছে। বিভিন্ন প্রাচীন গ্রন্থে বিক্ষিপ্ত ভাবে প্রাপ্ত কিছু তথ্য থেকে জানা যায় যে ইনি শালাতুর গ্রামের বাসিন্দা। যা বর্তমানে পাকিস্থান রাষ্ট্রের অন্তর্গত। শালাতুর গ্রামের বাসিন্দা হওয়ার জন্য তাকে 'শালাতুরীয়' বলে বিশেষিত করা হয়েছে। আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম থেকে খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর মধ্যে মহামুনি পাণিনির আবির্ভাব কাল ধরা হয়। সম্ভবত তার মায়ের নাম ছিল দাক্ষী ও পিতা ছিলেন শলঙ্কি। সেই জন্য তাকে বিভিন্ন গ্রন্থে দাক্ষীপুত্র ও শালঙ্কি নামে অভিহিত করা হয়েছে। বৈয়াকরণ ব্যাড়িকে অনেকে তার সমসাময়িক বলে থাকেন। সম্ভবত তিনি ছিলেন পাণিনির মাতুল বা মাতুল পুত্র। বিভিন্ন গ্রন্থে ছন্দঃসূত্রকার পিঙ্গলাচার্যকে পাণিনির অনুজ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তার গুরুর নাম ছিল বর্ষ বা উপবর্ষ। বৈয়াকরণ কৌৎস প্রভৃতিকে তার শিষ্য হিসাবে বলা হয়। বৈয়াকরণ হিসাবে পাণিনির প্রসিদ্ধি হলেও শোনা যায় জাম্ববতীবিজয়ম্ বা পাতালবিজয়ম্ নামক কাব্যগ্রন্থটি তারই রচনা। এছাড়াও তিনি ধাতুপাঠ, গণপাঠ, উণাদিপাঠ, লিঙ্গানুশাসন প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। অষ্টাধ্যায়ী সূত্রপাঠ সহিত এগুলিকে একত্রে 'পঞ্চাঙ্গ ব্যাকরণ' বলা হয়ে থাকে। তবে তার শ্রেষ্ট কীর্তি হল অষ্ট অধ্যায়, বত্রিশ পাদ সমন্বিত, সূত্রাত্মক অষ্টাধ্যায়ী।

মহামুনি পাণিনি তার এই অষ্টাধ্যায়ীকে সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ করার জন্য বিশেষ কতকগুলি মৌলিক কৌশল অবলম্বন করেছিলেন। যেমন তিনি প্রচলিত প্রাচীন বৈয়াকরণদের ব্যবহৃত প্রাতিপদিক, কারক, সমাস, উপসর্গ, অব্যয়, নিপাত প্রভৃতি অকৃত্রিম মহাসংজ্ঞাগুলি যেমন ব্যবহার করেছিলেন তেমনি তার নিজস্ব সৃষ্ট কিছু কৃত্রিম লঘুসংজ্ঞা টি, ঘু, উপধা, নদী, ভ, প্রভৃতি তার ব্যাকরণকে অনেক সংক্ষিপ্ত ও মৌলিক করে তুলেছিল। এইরকম ভাবেই পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ীকে একটি নির্দিষ্ট ছকে বাধাঁর জন্য অনুবৃত্তি, বিপরিণাম, আগম, আদেশ, ইৎসংজ্ঞা, অনুবন্ধলোপ প্রভৃতি পারিভাষিক সংজ্ঞা ও কৌশলেরও অবতারণা করেছেন। পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে বুঝতে গেলে এই সমস্ত পারিভাষিক সংজ্ঞাগুলির জ্ঞান থাকা আবশ্যক তা না হলে আমরা শাস্ত্রে প্রবেশই করতে পারব না। মূলত আমরা এই প্রবন্ধে অষ্টাধ্যায়ীতে ব্যবহৃত ইৎসংজ্ঞা তথা অনুবন্ধলোপ বিষয়টি কি? প্রত্যয়ের সঙ্গে সংযুক্ত ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলি লুপ্ত হয়ে যাবে জেনেও মহামুনি পাণিনি কেন ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলিকে তার সঙ্গে যুক্ত রেখেছেন? এবিষয়ে কি যৌক্তিকতা রয়েছে এবং অষ্টাধ্যায়ীতে ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলির গুরুত্বই বা কি? তা এই ক্ষুদ্র পরিসরে আলোচনা করে নেব।

ইৎসংজ্ঞা তথা অনুবন্ধলোপ: মহামুনি পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ীতে বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞার ব্যবহার করেছেন। তার মধ্যে ইৎসংজ্ঞাকরণ তথা অনুবন্ধলোপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। অষ্টাধ্যায়ীতে ইৎসংজ্ঞার তথা অনুবন্ধলোপের যৌক্তিকতা ও গুরুত্ব বুঝতে গেলে আগে আমাদের জানতে হবে ইৎসংজ্ঞা কি? আর অনুবন্ধলোপই বা কি? পাণিনি ইৎসংজ্ঞা বিষয়ে তার অষ্টাধ্যায়ীতে ছয়টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন-১। উপদেশেঽজনুনাসিকো ইৎ, ২। হলন্ত্যম্, ৩। আদির্ঞিটুডবঃ ৪। ষঃ প্রত্যয়স্য। ৫। চুটূ, এবং ৬। লশকৃতদ্ধিতে।

উপদেশেS জনুনাসিকো ইৎ (১/৩/২): উপদেশে যদি কোন অনুনাসিক অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণ থাকে তাহলে তার ইৎসংজ্ঞা হবে এবং 'তস্য লোপঃ' (১/৩/৯) সূত্রানুসারে যার ইৎসংজ্ঞা হবে তার লোপ হয়ে যাবে। যেমন এধ-ধাতুতে (এ ধ্ অ) দুটি অচ্ অর্থাৎ স্বরবর্ণ আছে। এর মধ্যে অকারটি হল অনুনাসিক অচ্ ফলে প্রকৃত সূত্রবলে তার ইৎসংজ্ঞা হবে এবং লোপ হয়ে গিয়ে 'এধ্' এইরূপে পরিবর্তিত হয়ে যাবে এবং পরবর্তীতে ব্যকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি অনুসারে এধতে, এধেতে প্রভৃতি রূপসিদ্ধি হবে।

হলন্ত্যম্ (১/৩/৩): পাণিনির এই সূত্রটির মধ্যে দুটি পদ আছে হল্ ও অন্ত্যম্। সূত্রটিতে অনুবৃত্তি নামক পদ্ধতির দ্বারা উপদেশে পদটি গ্রহণ করলে সূত্রটির অর্থ হবে উপদেশে যেটি অন্ত হল্ বর্ণ অর্থাৎ অন্ত ব্যঞ্জনবর্ণ তার ইৎসংজ্ঞা হবে এবং 'তস্য লোপঃ' (১/৩/৯) সূত্রানুসারে যার ইৎসংজ্ঞা হবে তার লোপ হয়ে যাবে। যেমন ঘঞ্-প্রত্যয় হল একটি উপদেশ এবং এর ঞ্-টি হল অন্ত হল্-বর্ণ তাই 'হলন্ত্যম্' সূত্রানুসারে এর ইৎসংজ্ঞা হবে এবং 'তস্য লোপঃ' সুত্রানুসারে তার লোপ হয়ে যাবে। ইৎসংজ্ঞা হয়ে যে সমস্ত বর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় তাকে পাণিনীয় ব্যাকরণশাস্ত্রে অনুবন্ধলোপ বলা হয়ে থাকে।

আদির্ঞিটুডবঃ (১/৩/৫): সমুদায়ের আদিতে বিদ্যমান 'ঞি', 'টু', 'ডু' প্রভৃতির ইৎসংজ্ঞা হয় প্রকৃত সূত্রানুসারে। 'ঞিমিদা' এখানে ঞ্-কারের লোপ হয়ে গিয়ে ব্যাকরণের নিয়মানুসারে মিন্নঃ রূপটি সিদ্ধ হয়। 'টুবেপৃ' এই সমুদায়ের টু-এর লোপ হয়ে গিয়ে বেপথুঃ পদ নিষ্পন্ন হয়। 'ডুপচষ্' এই সমুদায়ে ডু-এর ইৎসংজ্ঞা হয়ে তার লোপ হয়ে গেলে পাণিনি ব্যাকরণের আরও অন্যান্য নিয়মানুসারে পক্ত্রিমম্ পদটি নিষ্পন্ন হয়।

ষঃ প্রত্যয়স্য (১/৩/৬): প্রত্যয়ের আদিতে স্থিত 'ষ'-কার প্রকৃত সূত্রে ইৎসংজ্ঞক হয় এবং 'তস্য লোপঃ' সূত্রানুসারে লুপ্ত হয়ে যায়। যথা নৃত্ + ষ্নুন্ এই স্থলে 'হলন্ত্যম্' ও আলোচ্য সূত্রানুসারে যথাক্রমে ষ্নুন্-প্রত্যয়ের ন্-কার ও ষ্-কারের ইৎসংজ্ঞা হয় এবং লুপ্ত হয়ে যায়। অনন্তর নৃত্ + বু পরে থাকলে 'যুবোরনাকৌ' সূত্রানুসারে বু-স্থানে অক-আদেশে নৃত্ + অক হলে 'সার্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে নৃত্-ধাতুর ইগন্তাঙ্গের গুণ হলে অর্-আদেশে ন্ অর্, ত্ + অক উৎপন্ন হলে বর্ণ সংযোগে নর্তক পদ সিদ্ধ হয়।

চুটূ (১/৩/৭): প্রত্যয়ের আদিতে যদি চ-বর্গ (চ্,ছ্,জ্,ঝ্,ঞ্) ও ট-বর্গ (ট্,ঠ্,ড্,ঢ্,ণ্) থাকে তাহলে তার ইৎসংজ্ঞা হবে ও লোপ হয়ে যাবে। যেমন কুঞ্জ + চ্ফঞ্ এখানে 'হলন্ত্যম্' ও আলোচ্য সূত্রে যথাক্রমে চ্ ফঞ্-প্রত্যয়ের ঞ্-কার ও চ্-কারের ইৎসংজ্ঞা হয়ে লোপ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে ব্যাকরণের বিভিন্ন নিয়মানুসারে কৌঞ্জায়নঃ প্রভৃতি পদ সিদ্ধ হয়।

লশকৃতদ্ধিতে (১/৩/৮): অতদ্ধিত প্রত্যয়ের আদিতে যদি ল-কার, শ-কার, অথবা ক-বর্গ (ক্,খ্,গ্,ঘ্,ঙ্) থাকে তাহলে তার ইৎসংজ্ঞা হবে ও লোপ হয়ে যাবে। যেমন- চি + ল্যুট্ এখানে 'হলন্ত্যম্' ও আলোচ্য সূত্রে যথাক্রমে ট্-কার ও ল্-কারের লোপ ইৎসংজ্ঞা হয়ে লোপ হয়ে যায়। অনন্তর 'যুবোরনাকৌ' সূত্রানুসারে যু-স্থানে অন-আদেশে। চি + অন হলে 'সার্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে ধাতুর ইগন্ত অঙ্গের গুণ হলে চে + অন হয় । অনন্তর 'এচোS য়াবায়াবঃ' সূত্রানুসারে এ-স্থানে অয়্-আদেশে ও বর্ণ সংযোগে চয়নম্ পদটি সিদ্ধ হয়।

সাধারণভাবে পাণিনির এই ছয়টি সূত্রের প্রভাবেই উপদেশ অর্থাৎ ধাতু, প্রত্যয়ের সঙ্গে সংযুক্ত বিভিন্ন বর্ণের ইৎসংজ্ঞা হয়ে থাকে এবং সব ক্ষেত্রেই 'তস্য লোপঃ' সূত্রানুসারে ইৎসংজ্ঞক ধ্বনিটির লোপ হয়ে যায়। এখন প্রশ্ন হবে ধাতু, প্রত্যয়, প্রভৃতির মধ্যস্থিত যে বর্ণ বা বর্ণগুলি উপরিউক্ত ছয়টি সূত্রের মাধ্যমে ইৎসংজ্ঞা হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে লোপ হয়ে যায় সেই সমস্ত বর্ণ বা বর্ণগুলিকে ধাতু, প্রত্যয় প্রভৃতির সঙ্গে যুক্ত করে রাখা হয় কেন; যখন তাদের লোপই হয়ে যাবে? বৈয়াকরণরা সবসময়ই ব্যাকরণকে সংক্ষিপ্ত করতে চান। প্রচলিত আছে- 'অর্ধমাত্রালাঘবেন পুত্রোৎসবঃ মন্যতে বৈয়াকরাণাঃ' অর্থাৎ কোন সূত্রে বা কোথাও যদি তারা অর্ধমাত্রা লাঘব করতে পারেন তাহলে তারা সন্তানলাভ তুল্য আনন্দ লাভ করেন। তাহলে ধাতু, প্রত্যয় প্রভৃতির মধ্যে যে সমস্ত বর্ণ বা বর্ণগুলি ইৎসংজ্ঞা হয়ে লুপ্ত হয়ে যায় তাহলে সেগুলি উল্লেখ না করাই তো ভালো তাতে সূত্রলাঘব হবে। যেমন দৃশ্ + ল্যুট্ এখানে ল্যুট্-প্রত্যয়ের ট্-কার 'হলন্ত্যম্' ও ল্-কার 'লশকৃতদ্ধিতে' সূত্রানুসারে ইৎসংজ্ঞক হয়ে লুপ্ত হয়ে যায়। পড়ে থাকে দৃশ্ + যু। অনন্তর 'যুবোরনাকৌ' সূত্রানুসারে যু-স্থানে অন-আদেশ হলে দৃশ্ + অন হয়। এবং 'সার্বধাতুকার্দ্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে ধাতুর ঋ-কারের গুণ হলে ঋ-এর জায়গায় অর্-আদেশে দ্ অর্ শ্ + অন উৎপন্ন হয় এবং বর্ণ সংযোগে দর্শন শব্দটি তৈরি হয়। এখানে সাধারণভাবে মনে হবে ল্যুট্-প্রত্যয়ের ট্ ও ল্ এর যখন লোপ হয়ে যায় তাহলে ল্যুট্-প্রত্যয়টিকে যু-প্রত্যয় বলাই ভালো তাতে লাঘব হবে। কিন্তু এইরকম করলে পদসাধনে অসুবিধা হবে কার্যত পাণিনীয় ব্যাকরণশাস্ত্রের যথাযথ জ্ঞানই সম্ভব হবে না। পাণিনীয় ব্যাকরণে উপদেশের অর্থাৎ বিভিন্ন ধাতু, প্রত্যয়ের ইৎসংজ্ঞক যে বর্ণ বা বর্ণগুলি থাকে তাদেরকে পাণিনীয় ব্যাকরণশাস্ত্রে অনুবন্ধ বলা হয়। ধাতু ও প্রত্যয়ের যে সমস্ত বর্ণ গুলি লুপ্ত হয়ে যায় বা পরক্ষণে লুপ্ত হয়ে যাবে তাদেরকেই অনুবন্ধ নামে আখ্যায়িত করা হয়- 'লোপযোগ্যত্বং। মূলত ইৎসংজ্ঞাকরণ ও

অনুবন্ধলোপ মহামুনি পাণিনির এক বিজ্ঞানসম্মত কৌশল যা তার ব্যাকরণগ্রন্থকে সংক্ষিপ্ত, সারগর্ভ, যৌক্তিক ও মৌলিক করে তুলেছে। মহামুনি পাণিনি প্রত্যয়ের মধ্যে ইৎসংজ্ঞক বর্ণ বা অনুবন্ধগুলিকে সংযুক্ত রাখার মধ্য দিয়ে শব্দগঠনে এক মহৎ কার্য সাধন করেছেন। যা পুত্র লাভের আনন্দের থেকেও বহুগুণে অধিক।

মহামুনি পাণিনি প্রত্যয়ের ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলিকে বা অনুবন্ধগুলিকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যয়গুলির অন্য একরকমের বিভাগ করেছেন যা তার মহামতি ও অত্যন্ত বিচক্ষণতার পরিচয় বহন করে। তিনি প্রত্যয়ের অনুবন্ধগুলিকে কাজে লাগিয়ে প্রত্যয়গুলিকে টিৎ, কিৎ, ঞিৎ, ণিৎ, ঞিৎ, গিৎ, শিৎ প্রভৃতি বিভাগে ভাগ করেছেন। যার ফলে পদসাধনের প্রক্রিয়া অনেক বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে। এবার আমরা কয়েকটি উদাহরণ সহযোগে অষ্টাধ্যায়ীতে ব্যবহৃত প্রত্যয়গুলিতে ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলি লুপ্ত হয়ে যাবে জেনেও পাণিনি কেন সে গুলিকে বর্জন না করে প্রত্যয়ের সঙ্গে সংযুক্ত রেখেছেন তার পিছনের যৌক্তিকতাই বা কি, তা দেখে নেব।

অনুবন্ধলোপ ও টিৎ, কিৎ-প্রত্যয়: পূর্বেই আমরা ইৎসংজ্ঞা বিধায়ক ছয়টি সূত্র আলোচনা করেছি। এবং কিভাবে কোন প্রত্যয়ের কোন বর্ণের ইৎসংজ্ঞা হয় তা কিছুটা অনুমান নিশ্চয় করা যাচ্ছে। যে সমস্ত প্রত্যয়ের ট্-কার লোপ যায় পাণিনি তাদেরকে টিৎ নামে অভিহিত করেছেন এবং টিৎসংজ্ঞাকে উপজীব্য করে 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ', 'টিত আত্মনেপাদানাং টেরে' প্রভৃতি সূত্র রচনা করেছেন। যার ফলে পদসাধন প্রক্রিয়া অনেক বিজ্ঞানসম্মত হয়েছে। যেমন- 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' এই সূত্রটির অর্থ হল ষষ্ঠী নির্দিষ্ট স্থানীর টিৎ ও কিৎ যথাক্রমে স্থানীর আদি ও অন্তে বসবে। 'ভবিতা' পদসিদ্ধি সহযোগে বিষয়টি বুঝে নেওয়া যাক। ভূ ধাতুর লুট্-লকারে প্রথমপুরুষের একবচনে ভূ তা এই স্থিতিতে 'আর্ধধাতুকস্যেড্ বলাদেঃ' (৭/২/৩৫) সূত্রানুসারে বল্-প্রত্যাহারের অন্তর্গত বর্ণ আদিতে আছে এমন আর্ধধাতুক প্রত্যয় 'তা' পরে থাকার জন্য 'ইট্'-আগম হয়। এখন প্রশ্ন হল এই 'ইট্' বসবে কোথায়? ধাতুর ঠিক আগে, ধাতুর ঠিক পরে, বিভক্তির ঠিক আগে, না বিভক্তির ঠিক পরে, এইভাবে 'ইট্'-আগমের বিভিন্ন স্থানে বসার সম্ভাবনা তৈরি হয়। আলোচ্য সূত্রে সেই স্থানটিই নির্দিষ্ট করা আছে। সূত্রানুযায়ী যদি আগমটি 'টিৎ' হয় তাহলে তা বিভক্তির পূর্বে বসবে আর যদি আগমটি কিৎ হয় তাহলে তা বিভক্তির পরে বসবে। ভূ তা এই স্থলে 'ইট্'-আগমটি এক রকমের টিৎ। কারণ 'হলন্ত্যম্' সূত্রানুসারে এর ট্-কারের ইৎসংজ্ঞা হয়ে লোপ হয়ে যায় তাই 'ইট্'-আগম এক রকমের টিৎ। পাণিনি এই টিৎসংজ্ঞাকেই উপজীব্য করে 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ ' প্রভৃতি সূত্রের রচনা করেছেন। যার ফলস্বরূপ ভূ তা এখানে ইট্-আগমটি তা এর আগে বসে ভূ ই তা এইরূপ হলে 'সার্বধাতুকয়ার্দ্ধধাতুকয়োঃ' সূত্রানুসারে ভূ-ধাতুর ইগন্ত অঙ্গের গুণ হলে ভো ই তা হয়। অনন্তর 'এচোS য়বায়াবঃ' সূত্রানুসারে ও-স্থানে অব-আদেশে ভ্ অব্ ই তা উৎপন্ন হলে বর্ণসংযোগে ভবিতা পদ সিদ্ধ হয়। তাহলে নিশ্চয়ই বোঝা যাচ্ছে যে পাণিনীয় ব্যাকরণে ইৎসংজ্ঞা তথা অনুবন্ধলোপের যৌক্তিকতাটা কোথায়?

একই রকমভাবে যে সমস্ত প্রত্যয়ের ক্-কারের ইৎসংজ্ঞা হয় সেই সমস্ত প্রত্যয়কে পাণিনি কিৎ-প্রত্যয় হিসাবে উল্লেখ করেছেন। যেখানে এইরকম কিৎ-প্রত্যয়ের অর্থাৎ ক্-কার ইৎ হয়েছে এমন প্রত্যয়ের আদেশ বা আগম হবে সেখানেও এই 'আদ্যন্তৌ' টকিতৌ' সূত্রানুসারে তা পরে বসবে। যেমন- পা ধাতুর উত্তর ণিচ্ লট্ প্রথম পুরুষের একবচনে পা ণিচ্ তি এর অনুবন্ধ লোপে পা ই তি হলে 'শাচ্ছাসাহ্বাব্যাবেপাং যুক্' (৭/৩/৩৭) সূত্রানুসারে 'যুক্'-আগম হলে তা কোথায় বসবে তার নিয়ে সংশয় জাগে। কিন্তু 'যুক্' প্রত্যয়ের ক্-কার 'হলন্ত্যম্' সূত্রানুসারে লোপ হওয়ার কারণে পাণিনীর নিয়মানুসারে সেটি কিৎ-প্রত্যয় রূপে পরিগণিত হয়। ফলে পূর্বের মতই 'আদ্যন্তৌ টকিতৌ' সূত্রানুযায়ী নিঃসংশয়ে পরে বসতে পারে এবং পা য়্

ই তি এইরকম স্থিতি তৈরি হয়। অনন্তর শপাগম, গুণ ও সন্ধিকার্য করলে পায়য়তি রূপটি সিদ্ধ হয়। এখানে যদি 'যুক্-কে কিৎ-প্রত্যয় রূপে সংজ্ঞায়িত না করা যেত তাহলে এই শুদ্ধ পদের বিশ্লেষণ আমরা করতে পারতাম না। সুতরাং পাণিনীয় ব্যাকরণে ইৎসংজ্ঞা ও অনুবন্ধ লোপের এক বিশেষ ভূমিকা স্বতই স্বীকার্য। এইভাবেই মহামতি পাণিনি অনুবন্ধগুলিকে সচেতন ভাবে বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনে প্রত্যয় প্রভৃতিতে প্রয়োজন ছাড়াও যুক্ত রেখে তাদেরকে ণিৎ, শিৎ, পিৎ, ঙিৎ, গিৎ প্রভৃতি রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং সেগুলিকে ব্যবহার করে সংস্কৃত ব্যাকরণের বিভিন্ন কার্যসিদ্ধি করেছেন। অনুবন্ধ লোপের উপর নির্ভর করে পানিনি এইরকম বহু সূত্র রচনা করেছেন। এখানে সংক্ষেপে তার কয়েকটি অংশ তুলে ধরা হয়েছে মাত্র।

অনুবন্ধলোপ ও মাহেশ্বরসূত্র: পাণিনির এই অনুবন্ধলোপের যৌক্তিকতার ব্যাখ্যা পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী মেরুদণ্ড স্বরূপ চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রেও বিশেষ ভাবে ব্যাখ্যাত। ইৎসংজ্ঞাকরণের ও অনুবন্ধ লোপের ভূমিকা পাণিনি ব্যাকরণে কতটা; তা এই চতুর্দশ মাহেশ্বর সূত্রের তাৎপর্য বিশ্লেষণেও বোঝা যায়। মাহেশ্বর সূত্রের অন্যতম ফল হল প্রত্যাহারগঠন অর্থাৎ একাধিক বর্ণকে অতি সংক্ষেপে প্রকাশ করার একটি কৌশল। এটিও পাণিনি ব্যাকরণের একটি পারিভাষিক শব্দ। প্রত্যাহার গঠনের অন্যতম সূত্রটি হল 'আদিরন্ত্যেন সহেতা'। সূত্রটিতে আদিঃ, অন্ত্যেন, সহ, ইতা চারটি পদ আছে। সূত্রটির অর্থ হল অন্ত ইৎবর্ণের সঙ্গে আদি বর্ণ মিলিত হয়ে যা গঠিত হয় তাই হল প্রত্যাহার। যেমন আমাদের চোদ্দটি মাহেশ্বর সূত্র আছে- ১। অ ই উ ণ্ ২। ঋ ৡ ক্ ৩। এ ও ঙ্ ৪। ঐ ঔ চ্ ৫। হ য ব র ট্ ৬। ল ণ্ ৭ ঞ ম ন ণ ম্ ৮। ঝ ভ য্ ৯ ঘ ঢ ধ শ্ ১০। জ ব গ ড দ শ্ ১১। খ ফ ছ ঠ থ চ ট ত ব্ ১২। ক প য্ ১৩। শ ষ স র্ ১৪। হ ল্ । এই মাহেশ্বর সূত্রগুলির শেষের হলন্ত বর্ণগুলিকে ইৎসংজ্ঞক বলা হয়। কারণ এই বর্ণগুলি লুপ্ত হয়ে যায়। 'আদিরন্ত্যেন সহেতা' সূত্রানুসারে অ ই উ ণ্ সূত্রের অন্ত ইৎবর্ণ ণ্-কারের সঙ্গে আদি বর্ণ অর্থাৎ অ-কার মিলিত হয়ে 'অণ্' প্রত্যাহার গঠিত হয়। 'অণ্' প্রত্যাহার হল অ, ই, উ এই তিনটি বর্ণের সংক্ষিপ্ত রূপ। এইরকম ভাবে ঐ ঔ চ্-এর অন্ত ইৎবর্ণ চ্-এর সহিত তার সাপেক্ষে তার পূর্বে বিদ্যমান সমস্ত বর্ণই আদি হওয়াতে 'অচ্' 'এচ্' 'ঐচ্' প্রভৃতি প্রত্যাহার গঠিত হয়। এই মাহেশ্বর সূত্রগুলি থেকে বহু প্রত্যহার গঠন করা যায় কিন্তু পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ীতে কেবল ৪২ টি প্রত্যাহার সূত্রের মধ্যে ব্যবহার করেছেন এবং তিনি তার অভিষ্ট কার্যসিদ্ধি করেছেন। তিনি প্রত্যাহারকে ব্যবহার করে অষ্টাধ্যায়ীর বহু সূত্রকে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকাশ করেছেন এবং একটি ছকের মধ্যে সংস্কৃত ব্যাকরণকে বেঁধে ফেলেছেন। যেমন অচ্সন্ধি বিষয়ক 'ইকো যণচি' সূত্রটি দেখুন। সূত্রটিতে তিনটি পদ আছে ইকঃ, যণ্ ও অচি। এখানে তিনটি পদই মাহেশ্বর সূত্র প্রসূত প্রত্যাহার। ইকঃ বলতে ই উ ঋ ৡ এদের পরে যদি অচ্ অর্থাৎ অ, আ, ই প্রভৃতি সমস্ত স্বরবর্ণ থাকে তাহলে ইকের স্থানে অর্থাৎ ই উ ঋ ৡ এর স্থানে যণ্ হবে অর্থাৎ যথাক্রমে য্ ব্, র্ ল্ হবে। যথা- অনু + এষা = অন্বেষা এখানে উ এর জায়গায় ব-আদেশ হয়েছে। এইরকম ভাবে 'অক সবর্ণে দীর্ঘঃ', 'বৃদ্ধিরেচি', 'এচোऽয়ায়াবঃ', 'অদেঙ্ গুণঃ', 'বৃদ্ধিরাদৈচ্' 'হলন্ত্যম্' 'ইকো গুণবৃদ্ধী' প্রভৃতি সূত্রে পাণিনি প্রত্যাহারের ব্যবহার করেছেন। এখন বিষয় হচ্ছে মহামুনি পাণিনি ইৎসংজ্ঞাকে কাজে লাগিয়েই মাহেশ্বর সূত্র থেকে প্রত্যাহার তৈরি করেছেন এবং সেগুলি সূত্রের মধ্যে ব্যবহার করে তার ব্যাকরণকে অনেক যৌক্তিক, নির্ভুল ও সারগর্ভ করে তুলেছেন যা অন্যান্য বৈয়াকরণরা পারেননি। এখন যদি এই ইৎসংজ্ঞাকরণ বা অনুবন্ধলোপ নামক কৌশলটি পাণিনি অবলম্বন না করতেন তাহলে হয়তো পাণিনিও তার অষ্টাধ্যায়ীকে এত সুন্দর সুশৃঙ্খল ও সঙ্ঘবদ্ধ করে তুলতে পারতেন না।

পরিশেষে বলবো পাণিনি তার অষ্টাধ্যায়ীতে এইরকম বহু মৌলিক কৌশল অবলম্বন করেছেন। প্রবন্ধের সংক্ষিপ্ত পরিসরে তার সুগভীর আলোচনা সম্ভব নয়। তবে পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীকে বুঝতে গেলে তার ব্যবহৃত বিভিন্ন পারিভাষিক সংজ্ঞা ও বিভিন্ন কৌশলের জ্ঞান আমাদের অর্জন করে নিতে হবে। প্রয়োজনে ক্ষিতিশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'Technical Terms And Techique Of Sanskrit Grammar' নামক গ্রন্থটি দেখা যেতে পারে। অষ্টাধ্যায়ীর শুরুতেই মাহেশ্বর সূত্রে হলন্ত যুক্ত বর্ণগুলি অর্থাৎ ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলিকে এবং বিভিন্ন প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলিকে প্রাথমিক ভাবে দেখে তাদের কোন কাজ নেই বলে আমরা অনেকে মনে করি ও অপ্রয়োজনীয় বলে মনে করি। কিন্তু এটা আমাদের জ্ঞানের সংকীর্ণতার কারণেই হয়ে থাকে। ইৎসংজ্ঞাকরণের বা অনুবন্ধলোপের ব্যাপারটি না থাকলে মহামুনি পাণিনি পূর্বে উল্লেখিত সূত্রগুলি রচনা করতে পারতেন না এবং তা ব্যবহার করে ব্যাকরণের অভিষ্ট কার্যসিদ্ধি করে উঠতে পারতেন না। মূলত এই প্রবন্ধে প্রত্যয়ের সাথে যুক্ত ইৎসংজ্ঞক বর্ণগুলির তথা অনুবন্ধগুলির সাক্ষাৎ কাজ না থাকলেও সেগুলির গুরুত্ব পাণিনির অষ্টাধ্যায়ীর অন্যত্র আছে এবং অষ্টাধ্যায়ীর বহু সূত্রের অস্তিত্ব যে ইৎসংজ্ঞাকরণ ও অনুবন্ধলোপের উপর টিকে আছে সেটিই এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত পরিসরে আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা থেকে কোন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তি ও ছাত্রছাত্রীরা উপকৃত হলে বিশেষ কৃতজ্ঞ হব।

গ্রন্থপঞ্জী:

১। হালদার, গুরুপদ, ব্যাকরণ দর্শনের ইতিহাস, সংস্কৃত বুক ডিপো, দ্বিতীয় প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, জানুয়ারী ২০০৬, কলিকাতা।

২। ডঃ শ্ব ,রামেশ্বর, সাধারণ ভাষাবিজ্ঞান ও বাংলা ভাষা, পুস্তক বিপনি,প্রথম প্রকাশ, চতুর্থ সংস্করণ, বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ।

৩। ভট্টাচার্য, অমিয় কুমার, সংস্কৃত ব্যাকরণের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১১, কলিকাতা।

৪। মুন্সী, রত্না, সংস্কৃত ব্যাকরণ শাস্ত্রের ইতিহাস, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১৭, কলিকাতা।

৫। বন্দ্যোপাধ্যায়, সত্যরঞ্জন, সংস্কৃত বনাম বাংলা ব্যাকরণ, সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার, প্রথম প্রকাশ, ২০১৩, কলিকাতা।

৬। দেবশর্মা (চক্রবর্তী), কালীজীবন, শব্দশাস্ত্রের ইতিহাস, রামকৃষ্ণ মিশন ইনস্টিটিউশন অফ কালচার, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ১৯৯৫, কলিকাতা।

৭। ভট্টাচার্য, তপন শঙ্কর, অষ্টাধ্যায়ী, সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, মার্চ ২০১২, কলকাতা

৮। শাস্ত্রী, হৃষীকেশ ও লাহিড়ি, প্রবোধ চন্দ্র, পাণিনীয়ম্, দি ঢাকা স্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী, ষষ্ঠ সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ, আগস্ট ২০০৯, কলকাতা।

৯। ডঃ গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী (সংজ্ঞাপরিভাষা প্রকরণ), সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ, বৈশাখ ১৪২০, কলকাতা।

১০। গঙ্গোপাধ্যায়, মৃণালকান্তি, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী (অচ্সন্ধি এবং প্রকৃতিভাব প্রকরণ),সংস্কৃত বুক ডিপো, দ্বিতীয় প্রকাশ, সেপ্টেম্বর ২০১২, কলকাতা।

১১। ডঃ চক্রবর্তী, পার্বতী, ডঃ দাস, ধীরেন্দ্র কুমার, বৈয়াকরণ সিদ্ধান্তকৌমুদী (তিঙন্ত প্রকরণ),সংস্কৃত বুক ডিপো, প্রথম প্রকাশ, পুনর্মুদ্রণ, জুন ২০১২, কলকাতা।